প্রাককথন

প্রতিটি বাঙালি ছেলে মেয়ে যেমনটা মনে করে আমিও তেমনটাই ভেবেছিলাম; অর্থাৎ লেখাটা আমার রক্তে রয়েছে। সেই ভেবেই খাতার পর খাতা ভরিয়ে তুলেছিলাম। সেই সূত্রেই ২০০৮-০৯ নাগাদ পরিচিত হই কৌরব, ভিন্নমুখ, নতুন কবিতা, কবিতা ক্যাম্পাস, র, প্রভৃতি কিছু প্রথাবিরোধী পত্রিকাগোষ্ঠীর সাথে। kaurab.com বাংলা কবিতা বিষয়ক প্রথম বাংলা ওয়েব পত্রিকা। সেটা ঘাটতে ঘাটতে একদিন একটি বইয়ের বিজ্ঞাপন চোখে পড়লো-- 'মৌলবিবাদ থেকে নিখিলের দর্শনে'। মৌলবাদ নিয়ে আগেও দু'একটা বই পড়া ছিল; কিন্তু সেই 'বাদ' যে আসলে 'বিবাদ' তা স্পষ্ট ছিল না এবং তার থেকে বেরিয়ে যে একটা দিগন্তহীন নীল আকাশের দেখা পাওয়া যেতে পারে, তেমন ভাবে ভাবনাতেই ছিল না বিষয়টা। নামকরণের ওই আকর্ষণীয় ভঙ্গিটা, পাশাপাশি বিষয়বস্তু নিয়ে কল্পনাটা এমন বাড়াবাড়ি পর্যায়ে পৌঁছালো যে বইটার খোঁজ না পাওয়া পর্যন্ত স্বস্তি পাচ্ছিলাম না। কিন্তু 'নিখিলের দর্শন' কী আর সোজা কথা? বিভিন্ন দোকানে অর্ডার দিয়ে আনাতে ব্যর্থ হয়ে ২০১০ এ কলকাতা বইমেলায় কৌরবের স্টলে পৌঁছে গেলাম। কিন্তু হা হতোস্মি! আমাকে জানানো হল, লেখক নিজেই বই দিয়ে যান, আবার নিয়েও যান আর সেই সময় স্টলে বই নেই। অর্থাৎ বইটি পাওয়া গেল না। অতঃপর বছর খানেক কেটে গেল। তারপর কি মনে করে একদিন জহিরুল হাসানের 'সাহিত্যের ইয়ারবুক' থেকে লেখকের ঠিকানা সংগ্রহ করে লেখককে চিঠি লিখে ফেললাম। কিন্তু নিশ্চিত ছিলাম, এ চিঠি পৌঁছাবে না; কারণ আমার ধারণা ছিল ইয়ারবুকের অধিকাংশ ঠিকানা ও ফোন নম্বর 'ফেক'।

অথচ আমাকে আশ্চর্য করে এক সন্ধায় ফোন এল, 'আমি কলিম খান বলছি'। আমি আর কি বলব? আমার শিরদাঁড়া জুড়ে শীতল প্রবাহ! কয়েক মিনিটই কথা হয়েছিল ওঁর সাথে; তাও বি.এস.এন.এল-এর চিরাচরিত গন্ডগোলে। উনি আমায় শিলিগুড়ির বাসিন্দা শ্রী নারায়ণচন্দ্র দাসের ফোন নম্বর দিলেন। আশ্বাস এই যে, তার কাছেই কলিম খানের সমস্ত বইয়ের হদিশ পাওয়া যাবে।

অবশেষে নারায়ণ কাকুর সাথে যোগাযোগ। আনন্দ পাবলিশার্স-এর দোকানে বসে দীর্ঘ আড্ডা এবং বইগুলি সংগ্রহ করে হুমড়ি খেয়ে পড়তে বসা। 'মিন্টোস' নামক একটি চকলেটের কোম্পানি এড দেখায় চকলেটটা খেলে নাকি 'দিমাক কি বাত্তি জ্বালা দে'। মিন্টোস খেয়ে কি হয় আমি জানি না, কিন্তু কলিম খান পড়তে গিয়ে শব্দার্থ যে মস্তিষ্কের অলিতে গলিতে লুকিয়ে থাকা অন্ধকারে একটি একটি করে বাতি জ্বালিয়ে রীতিমতো ফর্সা করে দিতে পারে, তার বাস্তব অভিজ্ঞতা আমি লাভ করলাম।

... ততদিনে আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। প্রথাবিরোধীদের সঙ্গে মেলামেশার সুবাদে সব প্রচলিতকে অস্বীকার করতে শিখেছি। প্রচলিত সব চিন্তাকেই মৌলবাদ প্রসূত বলে মনে হচ্ছে। এমতাবস্থায় এক অধ্যাপককে পাওয়া গেল। নিপুণ যুক্তিতে প্রচলিতকে প্রশ্ন করে; পড়ার বিরক্তিকর একঘেয়ে ধারার বদলে অন্যধারায় ভাবতে বলেন। বাদল সরকারের 'এবং ইন্দ্রজিৎ' পড়াতে গিয়ে সত্যি বলতে আমার চিন্তা-ভাবনাগুলিকে ঘুলিয়ে দিয়ে একরকম নিজের ছাঁচে ফেলে দিলেন। এই যে নিজের চিন্তন প্রনালীর নশ্বরতাকে মেনে একটি কার্যকর চিন্তন প্রনালী গ্রহণের প্রচেষ্টা যে কি বিষম দ্বন্দ্বের, যন্ত্রণার; তা যার না হয়েছে সে জানে না। আর এভাবেই একদিন অধ্যাপক উৎপল মন্ডলকে ভালোবেসে ফেললাম।

ব্যক্তিগতভাবে আমি চিরকালই চুপচাপ গোছের। তাই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াকালীন সেভাবে স্যারের সাথে মেশা হয়নি। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় শেষে যখন বাড়িতে ফিরে এলাম তারপর থেকে ঘনিষ্ঠতা বাড়লো। এই ভিন্ন চিন্তকের কলিম খানের লেখাগুলি ভালো লাগবে আমি নিশ্চিত ছিলাম। তাই বলতেই তিনি প্রায় সবগুলি বই কিনে নিলেন এবং আকৃষ্ট হয়ে পড়লেন কলিম খানের লেখার দ্বারা। এর কয়েকটি কারণ সহজেই অনুমেয়। প্রথমত, মুক্ত বুদ্ধির মানুষ চিন্তার দুয়ারে খিল এঁটে রাখেন না; হাওয়া বাতাস চলাচলের জন্য পথ প্রশস্ত রাখেন। দ্বিতীয়ত, স্যারেরও ভেতর কোথাও একটি প্রথাবিরোধী সত্তা রয়েছে। সর্বত্র প্রশ্নের নজর; এপার থেকে ওপার দেখে নেওয়ার মতো গহন অতলস্পর্শী দৃষ্টি। ভগবান বুদ্ধ তাঁর নিজের এধরনের স্বভাবের জন্য নিজেকে সন্দেহবাদী বলতেন। তৃতীয়ত, কলিম খানের বিষয়গত অভিনবত্ব। প্রচলিত সমাজ ইতিহাসের একপ্রকার পুনর্নবীকরণ ঘটে গেছে তাঁর

হাতে। এই নতুন দৃষ্টিতে জগৎকে দেখে নেওয়ার একটা আকর্ষণ তাঁকে প্রভাবিত করে থাকবে। চতুর্থত এবং সর্বোপরি, নতুনকে গ্রহণ করার জন্য প্রয়োজন একটা উদার রাজার মতো হৃদয়। সেই হৃদয়ের মালিক হওয়া নিতান্ত সহজ কথা নয়। প্রাচীন ও আধুনিক মিলিয়ে যে বঙ্গমানস তারই অকৃত্তিম ঐশ্বর্যের মালিক তিনি। তাই সহজভাবেই কলিম খানের আনকোরা তত্ত্বকে গ্রহণ করতে পেরেছেন। আর আমাকেও ক্রমাগত সাহস জুগিয়ে গেছেন এই আপাত কঠিন বিষয়টি নিয়ে কাজ করার জন্য।

স্যারের দেওয়া সাহসের ওপর ভর করেই এই গবেষণা কার্যে হাত দেওয়া। সব সময় তাঁর পরামর্শ আমাকে পথনির্দেশ করে গেছে। মোটেও সহজ ছিল না বিষয়টা। প্রজ্ঞার সেই গভীরতার সামান্যতম স্পর্শও করতে পারিনি হয়তো, উপলব্ধি তো দূরস্থ। পরমাপ্রকৃতি স্বয়ং তাঁর আধার নির্বাচন করেন তাঁর কাঙ্খিত কাজের প্রয়োজনে। আসল কথা, তাঁর কাজ তিনিই করেন; মানুষ নিমিত্তমাত্র।

যাই হোক, এই অভিসন্দর্ভ রচনায় বহু জন বহু ভাবে আমায় সাহায্য করেছেন। সর্বোতভাবে আমায় সাহায্য করেছেন আমার পথনির্দেশক অধ্যাপক ড. উৎপল মন্ডল মহাশয়। এছাড়া বিভাগের অন্যান্য অধ্যাপকগণ, অধ্যাপক মঞ্জুলা বেরা, অধ্যাপক নিখিলেশ রায়, অধ্যাপক বিকাশ পাল, অধ্যাপক সূর্য লাম, অধ্যাপক উর্বী মুখার্জী, অধ্যাপক আশিষ রায়, অধ্যাপক শর্মিষ্ঠা পাল, অধ্যাপক প্লাবন সিংহ, অধ্যাপক হাসনারা খাতুন প্রমুখ আমার গবেষণাকর্মে নানা গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দিয়ে আমায় সমৃদ্ধ করেছেন। এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক ও কর্মীদের প্রতিও আমার অশেষ কৃতজ্ঞতা। বাংলা বিভাগের শিক্ষাকর্মী শ্রী রাজীব গোস্বামী ও শ্রী রমেশ চন্দ্র সিংহকেও আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

প্রথম দিকে স্বয়ং কলিম খান আমায় কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দিয়ে সমৃদ্ধ করেছেন। কাজ যখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে কাজ তখন তাঁর অকালে চলে যাওয়ায় ভেতরে গভীর নীরবতা বোধ করছি। এছাড়া সর্বশ্রী শ্রী নারায়ণ চন্দ্র দাস বহু বিষয়ে বহু গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দিয়ে আমায় সমৃদ্ধ করেছেন; আর কাকিমার হাতের সুস্বাদু রান্না এই জটিল তত্ত্বটিকেও সুস্বাদু করে তুলেছে। পরোক্ষভাবে শ্রীরবি চক্রবর্তীর

আশীর্বাদ লাভ করার সৌভাগ্য হয়েছে আমার। প্রভুর কাছে তাঁর দীর্ঘজীবন কামনা করি।

আমার আদরের ভাই শ্রী শুভ চন্দ আমায় কম্পিউটার প্রযুক্তি বিষয়ে প্রচুর সাহায্য করেছে। তাকে আমার ভালোবাসা। বাবা শ্রী পবিত্র কুমার চন্দ মা শ্রীমতী শিখা চন্দ সর্বক্ষণ ভাঙা-গড়ার সব পরিস্থিতিতে পাশে দাঁড়িয়েছেন; আমায় উৎসাহ জুগিয়েছেন। এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বন্ধু প্রসেনজিৎ দাস, তাপস মণ্ডল, তুফান রায়, রুদ্রানী সান্যাল, সুনন্দা ঘটক; অনুজ আহেসানউল্লা হক, পরিতোষ ভাই, সুব্রত পাল, নবীন দাস, দাদা উজ্জ্বল শীল, শিবনারায়ণ রাউত, ইউনুস মিঞা, সম্রাট দাস; মেখলিগঞ্জ নেতাজি পি.টি.টি.আইয়ের নূর আলম, ফারুক আহমেদ, প্রদ্যুত পাল, রাহুল দেব রায়, অখিল মণ্ডল, বিমান কর্মকার, সঙ্গীতা গাঙ্গুলী, অমিত সাহা, বাবাই দা, বাবন বসাক, নিত্যানন্দ রায় প্রমুখ; মেখলিগঞ্জ বিবেকানন্দ যুব পাঠচক্রের ভাইদের মধ্যে বনমালী দাস, অভিজিৎ বিশ্বাস, দীপ বর্মন, প্রভাত পাটনি, লিটন দাস, পল্টন শীল শর্মা, বিট্টু জোয়ারদার প্রমুখ; জলপাইগুড়ি যুব মহামন্ডলের শ্রী সমীর কুমার দাসগুপ্ত, শ্রী অনিন্দ্য বসু প্রমুখেরা কোনও না কোনও ভাবে আমার এই গবেষণাকর্মে সহায়তা করেছেন। সকলকে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা ভালোবাসা প্রণাম।

সর্বোপরি প্রণাম জানাই ঠাকুর শ্রী রামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রী মা, স্বামী বিবেকানন্দের অভয় চরণে; বহু দুর্যোগে মহাভয় থেকে তাঁরা আমায় রক্ষা করেছেন। শরীর বাঁচে নিশ্বাসে আর মন বাঁচে বিশ্বাসে; সেই বিশ্বাস যাতে চিরকাল তাদের অভয় চরণে থাকে মায়ের কাছে এই একমাত্র প্রার্থনা।